দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কালীবাড়ি ও উদ্যান

[শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি মধ্যে—চাঁদনি ও দ্বাদশ শিবমন্দির—পাকা উঠান ও বিষ্ণুঘর—শ্রী শ্রীভবতারিণী মা-কালী—নাটমন্দির—ভাঁড়ার, ভোগঘর, অতিথিশালা ও বলিদানের স্থান—দপ্তরখানা—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর—নহবত, বকুলতলা ও পঞ্চবটী—ঝাউতলা, বেলতলা ও কুঠি—বাসনমাজার ঘাট, গাজীতলা, সদর ফটক ও খিড়কি ফটক—হাঁসপুকুর, আস্তাবল, গোশালা ও পুষ্পোদ্যান—শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের বারান্দা—আনন্দনিকেতন।]

আজ রবিবার। ভক্তদের অবসর হইয়াছে, তাই তাঁহারা দলে দলে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে আসিতেছেন। সকলেরই অবারিত দ্বার। যিনি আসিতেছেন, ঠাকুর তাঁহারই সহিত কথা কহিতেছেন। সাধু, পরমহংস, হিন্দু, খ্রিস্টান, ব্রহ্মজ্ঞানী; শাক্ত, বৈষ্ণব; পুরুষ, স্ত্রীলোক—সকলেই আসিতেছেন। ধন্য রানী রাসমণি! তোমারই সুকৃতিবলে এই সুন্দর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আবার এই সচল প্রতিমা—এই মহাপুরুষকে লোকে আসিয়া দর্শন ও পূজা করিতে পাইতেছে।

[চাঁদনি ও দ্বাদশ শিবমন্দির]

কালীবাড়িটি কলিকাতা হইতে আড়াই ক্রোশ উত্তরে হইবে। ঠিক গঙ্গার উপরে। নৌকা হইতে নামিয়া সুবিস্তীর্ণ সোপানাবলী দিয়া পূর্বাস্য হইয়া উঠিয়া কালীবাড়িতে প্রবেশ করিতে হয়। এই ঘাটে পরমহংসদেব স্নান করিতেন। সোপানের পরেই চাঁদনি। সেখানে ঠাকুরবাড়ির চৌকিদারেরা থাকে। তাহাদের খাটিয়া, আমকাঠের সিন্দুক, দুই-একটা লোটা সেই চাঁদনিতে মাঝে মাঝে পড়িয়া আছে। পাড়ার বাবুরা যখন গঙ্গাস্নান করিতে আসেন, কেহ-কেহ সেই চাঁদনিতে বসিয়া খোশগল্প করিতে করিতে তেল মাখেন। যে-সকল সাধু-ফকির, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী অতিথিশালার প্রসাদ পাইবেন বলিয়া আসেন, তাঁহারাও কেহ-কেহ ভোগের ঘণ্টা পর্যন্ত এই চাঁদনিতে অপেক্ষা করেন। কখনও কখনও দেখা যায়, গৈরিকবস্ত্রধারিণী ভৈরবী ত্রিশূলহস্তে এই স্থানে বসিয়া আছেন। তিনিও সময় হলে অতিথিশালায় যাইবেন। চাঁদনিটি দ্বাদশ শিবমন্দিরের ঠিক মধ্যবর্তী। তন্মধ্যে ছয়টি মন্দির চাঁদনির ঠিক উত্তরে, আর ছয়টি চাঁদনির ঠিক দক্ষিণে। নৌকাযাত্রীরা এই দ্বাদশ মন্দির দূর হইতে দেখিয়া বলিয়া থাকে, ‘‘ওই রাসমণির ঠাকুরবাড়ি’’।

[পাকা উঠান ও বিষ্ণুঘর]

চাঁদনি ও দ্বাদশ মন্দিরের পূর্ববর্তী ইষ্টকনির্মিত পাকা উঠান। উঠানের মাঝখানে সারি সারি দুইটি মন্দির। উত্তরদিকে রাধাকান্তের মন্দির। তাহার ঠিক দক্ষিণে মা-কালীর মন্দির। ৺রাধাকান্তের মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ—পশ্চিমাস্য। সিঁড়ি দিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। মন্দিরতল মর্মর প্রস্তরাবৃত। মন্দিরের সম্মুখস্থ দালানে ঝাড় টাঙানো আছে—এখন ব্যবহার নাই, তাই রক্তবস্ত্রের আবরণী দ্বারা রক্ষিত। একটি দ্বারবান পাহারা দিতেছে। অপরাহ্ণে পশ্চিমের রৌদ্রে পাছে ঠাকুরের কষ্ট হয়, তাই ক্যামবিসের পর্দার বন্দোবস্ত আছে। দালানের সারি সারি খিলানের ফুকর উহাদের দ্বারা আবৃত হয়। দালানের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি গঙ্গাজলের জালা। মন্দিরের চৌকাঠের নিকট একটি পাত্রে শ্রীচরণামৃত। ভক্তেরা আসিয়া ঠাকুর প্রণাম করিয়া ওই চরণামৃত লইবেন। মন্দিরমধ্যে সিংহাসনারূঢ় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ। শ্রীরামকৃষ্ণ এই মন্দিরে পূজারির কার্যে প্রথম ব্রতী হন—১৮৫৭-৫৮ খ্রিস্টাব্দ।

[শ্রীশ্রীভবতারিণী মা-কালী]

দক্ষিণের মন্দিরে সুন্দর পাষাণময়ী কালী-প্রতিমা! মার নাম ভবতারিণী। শ্বেতকৃষ্ণমর্মরপ্রস্তরাবৃত মন্দিরতল ও সোপানযুক্ত উচ্চবেদী। বেদীর উপরে রৌপ্যময় সহস্রদল পদ্ম, তাহার উপর শিব, শব হইয়া দক্ষিণদিকে মস্তক—

www.udbodhan.org

উত্তরদিকে পা করিয়া পড়িয়া আছেন। শিবের প্রতিকৃতি শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত। তাঁহার হৃদয়োপরি বারাণসী-চেলিপরিহিতা নানাভরণালঙ্কৃতা এই সুন্দর ত্রিনয়নী শ্যামাকালীর প্রস্তরময়ী মূর্তি। শ্রীপাদপদ্মে নূপুর, গুজরিপঞ্চম, পাঁজেব, চুটকি আর জবা বিল্বপত্র। পাঁজেব পশ্চিমের মেয়েরা পরে। পরমহংসদেবের ভারী সাধ, তাই মথুরবাবু পরাইয়াছেন। মার হাতে সোনার বাউটি, তাবিজ ইত্যাদি। অগ্রহাতে—বালা, নারিকেল-ফুল, পঁইচে, বাউটি; মধ্যহাতে—তাড়, তাবিজ ও বাজু; তাবিজের ঝাঁপা দোদুল্যমান। গলদেশে—চিক, মুক্তার সাতনর মালা, সোনার বত্রিশ নর, তারাহার ও সুবর্ণনির্মিত মুণ্ডমালা; মাথায়—মুকুট; কানে—কানবালা, কানপাশ, ফুলঝুমকো, চৌদানি ও মাছ। নাসিকায়—নৎ, নোলক দেওয়া। ত্রিনয়নীর বাম হস্তদ্বয়ে নৃমুণ্ড ও অসি, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরাভয়। কটিদেশে নরকর-মালা, নিমফল ও কোমরপাটা। মন্দির মধ্যে উত্তর-পূর্ব কোণে বিচিত্র শয্যা—মা বিশ্রাম করেন। দেওয়ালের একপার্শ্বে চামর ঝুলিতেছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ওই চামর লইয়া কতবার মাকে ব্যজন করিয়াছেন। বেদীর উপর পদ্মাসনে রূপার গেলাসে জল। তলায় সারি সারি ঘটি; তন্মধ্যে শ্যামার পান করিবার জল। পদ্মাসনের উপর পশ্চিমে অষ্টধাতুনির্মিত সিংহ, পূর্বে গোধিকা ও ত্রিশূল। বেদীর অগ্নিকোণে শিবা, দক্ষিণে কালো প্রস্তরের বৃষ ও ঈশান কোণে হংস। বেদী উঠিবার সোপানে রৌপ্যময় ক্ষুদ্র সিংহাসনোপরি নারায়ণশিলা; একপার্শ্বে পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত অষ্টধাতুনির্মিত *রামলালা* নামধারী শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ মূর্তি ও বাণেশ্বর শিব। আরও অন্যান্য দেবতা আছেন। দেবী প্রতিমা দক্ষিণাস্যা। ভবতারিণীর ঠিক সম্মুখে, অর্থাৎ বেদীর ঠিক দক্ষিণে ঘটস্থাপনা হইয়াছে। সিন্দুররঞ্জিত, পূজান্তে নানাকুসুমবিভূষিত, পুষ্পমালাশোভিত মঙ্গলঘট। দেওয়ালের একপার্শ্বে জলপূর্ণ তামার ঝারি—মা মুখ ধুইবেন। ঊর্ধ্বে মন্দিরে চাঁদোয়া, বিগ্রহের পশ্চাৎদ্দিকে সুন্দর বারাণসী বস্ত্রখণ্ড লম্বমান। বেদীর চারিকোণে রৌপ্যময় স্তম্ভ। তদুপরি বহুমূল্য চন্দ্রাতপ—উহাতে প্রতিমার শোভা বর্ধন হইয়াছে। মন্দির দোহারা। দালানটির কয়েকটি ফুকর সুদৃঢ় কপাট দ্বারা সুরক্ষিত। একটি কপাটের কাছে চৌকিদার বসিয়া আছে। মন্দিরের দ্বারে পঞ্চপাত্রে শ্রীচরণামৃত। মন্দিরশীর্ষ নবরত্ন মণ্ডিত। নিচের থাকে চারিটি চূড়া, মধ্যের থাকে চারিটি ও সর্বোপরি একটি। একটি চূড়া এখন ভাঙিয়া রহিয়াছে। এই মন্দিরে এবং ৺রাধাকান্তের ঘরে পরমহংসদেব পূজা করিয়াছিলেন।

[নাটমন্দির]

কালীমন্দিরের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে সুন্দর সুবিস্তৃত নাটমন্দির। নাটমন্দিরের উপর শ্রীশ্রীমহাদেব এবং নন্দী ও ভৃঙ্গী। মার মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ৺মহাদেবকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতেন—যেন তাঁহার আজ্ঞা লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন। নাটমন্দিরের উত্তর-দক্ষিণে স্থাপিত দুই সারি অতি উচ্চস্তম্ভ। তদুপরি ছাদ। স্তম্ভশ্রেণীর পূর্বদিকে ও পশ্চিমদিকে নাটমন্দিরের দুই পক্ষ। পূজার সময়, মহোৎসবকালে, বিশেষতঃ কালীপূজার দিন নাটমন্দিরে যাত্রা হয়। এই নাটমন্দিরে রাসমণির জামাতা মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশে ধান্যমেরু করিয়াছিলেন। এই নাটমন্দিরেই সর্বসমক্ষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবীপূজা করিয়াছিলেন।

[ভাঁড়ার, ভোগঘর, অতিথিশালা, বলিস্থান]

চক্‌মিলান উঠানের পশ্চিমপার্শ্বে দ্বাদশ মন্দির, আর তিনপার্শ্বে একতলা ঘর। পূর্বপার্শ্বের ঘরগুলির মধ্যে ভাঁড়ার, লুচিঘর, বিষ্ণুর ভোগঘর, নৈবেদ্যঘর, মায়ের ভোগঘর, ঠাকুরদের রান্নাঘর ও অতিথিশালা। অতিথি, সাধু যদি অতিথিশালায় না খান, তাহা হইলে দপ্তরখানায় খাজাঞ্চীর কাছে যাইতে হয়। খাজাঞ্চী ভাণ্ডারীকে হুকুম দিলে সাধু ভাঁড়ার হইতে সিধা লন। নাটমন্দিরের দক্ষিণে বলিদানের স্থান।

বিষ্ণুঘরের রান্না নিরামিষ। কালীঘরের ভোগের ভিন্ন রন্ধনশালা। রন্ধনশালার সম্মুখে দাসীরা বড় বড় বঁটি লইয়া মাছ কুটিতেছে। অমাবস্যায় একটি ছাগ বলি হয়। ভোগ দুই প্রহর মধ্যে হইয়া যায়। ইতিমধ্যে অতিথিশালায় এক-একখানা শালপাতা লইয়া সারি সারি কাঙাল, বৈষ্ণব, সাধু অতিথি বসিয়া পড়ে। ব্রাহ্মণদের পৃথক স্থান করিয়া দেওয়া হয়। কর্মচারী ব্রাহ্মণদের পৃথক আসন হয়। খাজাঞ্চীর প্রসাদ তাঁহার ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। জানবাজারের বাবুরা আসিলে

www.udbodhan.org

কুঠিতে থাকেন। সেইখানে প্রসাদ পাঠানো হয়।

[দপ্তরখানা]

উঠানের দক্ষিণে সারি সারি ঘরগুলিতে দপ্তরখানা ও কর্মচারীদিগের থাকিবার স্থান। এখানে খাজাঞ্চী, মুহুরী সর্বদা থাকেন; আর ভাণ্ডারী, দাস-দাসী, পূজারি, রাঁধুনি, ব্রাহ্মণঠাকুর ইত্যাদির ও দ্বারবানদের সর্বদা যাতায়াত। কোন কোন ঘর চাবি দেওয়া; তন্মধ্যে ঠাকুরবাড়ির আসবাব সতরঞ্চি, শামিয়ানা ইত্যাদি থাকে। এই সারির কয়েকটা ঘর পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভাঁড়ার ঘর করা হইত। তাহার দক্ষিণদিকের ভূমিতে মহামহোৎসবের রান্না হইত।

উঠানের উত্তরে একতলা ঘরের শ্রেণী। তাহার ঠিক মাঝখানে দেউড়ি। চাঁদনির ন্যায় সেখানেও দ্বারবানেরা পাহারা দিতেছে। উভয় স্থানে প্রবেশ করিবার পূর্বে বাহিরে জুতা রাখিয়া যাইতে হইবে।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর]

উঠানের ঠিক উত্তর-পশ্চিম কোণে অর্থাৎ দ্বাদশ মন্দিরের ঠিক উত্তরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ঘর। ঘরের ঠিক পশ্চিমদিকে অর্ধমণ্ডলাকার একটি বারান্দা। সেই বারান্দায় শ্রীরামকৃষ্ণ পশ্চিমাস্য হইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন। এই বারান্দার পরেই পথ। তাহার পশ্চিমে পুষ্পোদ্যান, তৎপরে পোস্তা। তাহার পরেই পূতসলিলা সর্বতীর্থময়ী কলকলনাদিনী গঙ্গা।

[নহবত, বকুলতলা ও পঞ্চবটী]

পরমহংসদেবের ঘরের ঠিক উত্তরে একটি চতুষ্কোণ বারান্দা, তাহার উত্তরে উদ্যানপথ। তাহার উত্তরে আবার পুষ্পোদ্যান। তাহার পরেই নহবতখানা। নহবতের নিচের ঘরে তাঁহার স্বর্গীয়া পরমারাধ্যা বৃদ্ধা মাতাঠাকুরানী ও পরে শ্রীশ্রীমা থাকিতেন। নহবতের পরেই বকুলতলা ও বকুলতলার ঘাট। এখানে পাড়ার মেয়েরা স্নান করেন। এই ঘাটে পরমহংসদেবের বৃদ্ধা মাতাঠাকুরানীর ৺গঙ্গালাভ হয়। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ।

বকুলতলার আরও কিছু উত্তরে পঞ্চবটী। এই পঞ্চবটীর পাদমূলে বসিয়া পরমহংসদেব অনেক সাধনা করিয়াছিলেন, আর ইদানীং ভক্তসঙ্গে এখানে সর্বদা পাদচারণ করিতেন। গভীর রাত্রে সেখানে কখনও কখনও উঠিয়া যাইতেন। পঞ্চবটীর বৃক্ষগুলি—বট, অশ্বত্থ, নিম্ব,[১] আমলকী ও বিল্ব—ঠাকুর নিজের তত্ত্বাবধানে রোপণ করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া এখানে রজঃ ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই পঞ্চবটীর ঠিক পূর্বগায়ে একখানি কুটির নির্মাণ করাইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাতে আসিয়া অনেক ঈশ্বরচিন্তা, অনেক তপস্যা করিয়াছিলেন। এই কুটির এক্ষণে পাকা হইয়াছে।

পঞ্চবটী মধ্যে সাবেক একটি বটগাছ আছে। তৎসঙ্গে একটি অশ্বত্থগাছ। দুইটি মিলিয়া যেন একটি হইয়াছে। বৃদ্ধ গাছটি বয়সাধিক্যবশতঃ বহুকোটরবিশিষ্ট ও নানা পক্ষীসমাকুল ও অন্যান্য জীবেরও আবাসস্থান হইয়াছে। পাদমূলে ইষ্টকনির্মিত, সোপানযুক্ত, মণ্ডলাকারবেদীসুশোভিত। এই বেদীর উত্তর-পশ্চিমাংশে আসীন হইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সাধনা করিয়াছিলেন; আর বৎসের জন্য যেমন গাভী ব্যাকুল হয়, সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে কত ডাকিতেন। আজ সেই পবিত্র আসনোপরি বটবৃক্ষের সখীবৃক্ষ অশ্বত্থের একটি ডাল ভাঙিয়া পড়িয়া আছে। ডালটি একেবারে ভাঙিয়া যায় নাই। মূলতরুর সঙ্গে অর্ধসংলগ্ন হইয়া আছে। বুঝি সে-আসনে বসিবার এখনও কোন মহাপুরুষ জন্মেন নাই।

---

১ কোন কোন মতে—অশোক। প্রকাশক

www.udbodhan.org

[ঝাউতলা, বেলতলা ও কুঠি]

পঞ্চবটীর আরও উত্তরে খানিকটা গিয়া লোহার তারের রেল আছে। সেই রেলের ওপারে ঝাউতলা। সারি সারি চারিটি ঝাউগাছ। ঝাউতলা দিয়া পূর্বদিকে খানিকটা গিয়া বেলতলা। এখানেও পরমহংসদেব অনেক কঠিন সাধনা করিয়াছিলেন। ঝাউতলা ও বেলতলার পরেই উন্নত প্রাচীর। তাহারই উত্তরে গভর্ণমেন্টের বারুদঘর।

উঠানের দেউড়ি হইতে উত্তরমুখে বহির্গত হইয়া দেখা যায়, সম্মুখে দ্বিতল কুঠি। ঠাকুরবাড়িতে আসিলে রানী রাসমণি, তাঁহার জামাই মথুরবাবু প্রভৃতি এই কুঠিতে থাকিতেন। তাঁহাদের জীবদ্দশায় পরমহংসদেব এই কুঠির বাড়ির নিচের পশ্চিমের ঘরে থাকিতেন। এই ঘর হইতে বকুলতলার ঘাটে যাওয়া যায় ও বেশ গঙ্গাদর্শন হয়।

[বাসনমাজার ঘাট, গাজীতলা ও দুই ফটক]

উঠানের দেউড়ি ও কুঠির মধ্যবর্তী যে-পথ সেই পথ ধরিয়া পূর্বদিকে যাইতে যাইতে ডানদিকে একটি বাঁধাঘাটবিশিষ্ট সুন্দর পুষ্করিণী। মা-কালীর মন্দিরের ঠিক পূর্বদিকে এই পুকুরের একটি বাসনমাজার ঘাট ও উল্লিখিত পথের অনতিদূরে আর একটি ঘাট। পথপার্শ্বস্থিত ওই ঘাটের নিকট একটি গাছ আছে, তাহাকে গাজীতলা বলে। ওই পথ ধরিয়া আর একটু পূর্বমুখে যাইলে আবার একটি দেউড়ি— বাগান হইতে বাহিরে আসিবার সদর ফটক। এই ফটক দিয়া আলমবাজার বা কলিকাতার লোক যাতায়াত করেন। দক্ষিণেশ্বরের লোক খিড়কি ফটক দিয়া আসেন। কলিকাতার লোক প্রায়ই এই সদর ফটক দিয়া কালীবাড়িতে প্রবেশ করেন। সেখানেও দ্বারবান বসিয়া পাহারা দিতেছে। কলিকাতা হইতে পরমহংসদেব যখন গভীর রাত্রে কালীবাড়িতে ফিরিয়া আসিতেন, তখন এই দেউড়ির দ্বারবান চাবি খুলিয়া দিত। পরমহংসদেব দ্বারবানকে ডাকিয়া ঘরে লইয়া যাইতেন ও লুচিমিষ্টান্নাদি ঠাকুরের প্রসাদ তাহাকে দিতেন।

[হাঁসপুকুর, আস্তাবল, গোশালা, পুষ্পোদ্যান]

পঞ্চবটীর পূর্বদিকে আর একটি পুষ্করিণী—নাম হাঁসপুকুর। ওই পুষ্করিণীর উত্তর-পূর্ব কোণে আস্তাবল ও গোশালা। গোশালার পূর্বদিকে খিড়কি ফটক। এই ফটক দিয়া দক্ষিণেশ্বরের গ্রামে যাওয়া যায়। যে-সকল পূজারি বা অন্য কর্মচারী পরিবার আনিয়া দক্ষিণেশ্বরে রাখিয়াছেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা এই পথ দিয়া যাতায়াত করেন।

উদ্যানের দক্ষিণপ্রান্ত হইতে উত্তরে বকুলতলা ও পঞ্চবটী পর্যন্ত গঙ্গার ধার দিয়া পথ গিয়াছে। সেই পথের দুইপার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ। আবার কুঠির দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া পূর্ব-পশ্চিমে যে-পথ গিয়াছে তাহারও দুইপার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ। গাজীতলা হইতে গোশালা পর্যন্ত কুঠি ও হাঁসপুকুরের পূর্বদিকে যে-ভূমিখণ্ড, তাহার মধ্যেও নানাজাতীয় পুষ্পবৃক্ষ, ফলের বৃক্ষ ও একটি পুষ্করিণী আছে।

অতি প্রত্যূষে পূর্বদিক রক্তিমবর্ণ হইতে না হইতে যখন মঙ্গলারতির সুমধুর শব্দ হইতে থাকে ও সানাইয়ে প্রভাতী রাগরাগিণী বাজিতে থাকে, তখন হইতেই মা-কালীর বাগানে পুষ্পচয়ন আরম্ভ হয়। গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীর সম্মুখে বিল্ববৃক্ষ ও সৌরভপূর্ণ গুলচী ফুলের গাছ। মল্লিকা, মাধবী ও গুলচী ফুল শ্রীরামকৃষ্ণ বড় ভালবাসেন। মাধবীলতা শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে আনিয়া তিনি পুঁতিয়া দিয়াছেন। হাঁসপুকুর ও কুঠির পূর্বদিকে যে-ভূমিখণ্ড তন্মধ্যে পুকুরের ধারে চম্পক বৃক্ষ। কিয়দ্দূরে ঝুমকাজবা, গোলাপ ও কাঞ্চনপুষ্প। বেড়ার উপরে অপরাজিতা—নিকটে জুঁই, কোথাও বা শেফালিকা। দ্বাদশ মন্দিরের পশ্চিমগায়ে বরাবর শ্বেতকরবী, রক্তকরবী, গোলাপ, জুঁই, বেল। ক্বচিৎ বা ধুস্তুরপুষ্প—মহাদেবের পূজা হইবে। মাঝে মাঝে তুলসী—উচ্চ ইষ্টকনির্মিত মঞ্চের উপর রোপণ করা হইয়াছে। নহবতের দক্ষিণদিকে বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, গোলাপ। বাঁধাঘাটের অনতিদূরে পদ্মকরবী ও কোকিলাক্ষ। পরমহংসদেবের ঘরের পাশে দুই-একটি কৃষ্ণচূড়ার বৃক্ষ ও আশেপাশে বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, গোলাপ, মল্লিকা, জবা, শ্বেতকরবী, রক্তকরবী আবার পঞ্চমুখী জবা, চীন জাতীয় জবা।

www.udbodhan.org

শ্রীরামকৃষ্ণও এককালে পুষ্পচয়ন করিতেন। একদিন পঞ্চবটীর সম্মুখস্থ একটি বিল্ববৃক্ষ হইতে বিল্বপত্র চয়ন করিতেছিলেন। বিল্বপত্র তুলিতে গিয়া গাছের খানিকটা ছাল উঠিয়া আসিল। তখন তাঁহার এইরূপ অনুভূতি হইল যে, যিনি সর্বভূতে আছেন তাঁর না জানি কত কষ্ট হইল! অমনি আর বিল্বপত্র তুলিতে পারিলেন না। আর একদিন পুষ্পচয়ন করিবার জন্য বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় কে যেন দপ্ করিয়া দেখাইয়া দিল যে, কুসুমিত বৃক্ষগুলি যেন এক-একটি ফুলের তোড়া, এই বিরাট শিবমূর্তির উপর শোভা পাইতেছে—যেন তাঁহারই অহর্নিশ পূজা হইতেছে। সেইদিন হইতে আর ফুল তোলা হইল না।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের বারান্দা]

পরমহংসদেবের ঘরের পূর্বদিকে বরাবর বারান্দা। বারান্দার একভাগ উঠানের দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণমুখো। এ-বারান্দায় পরমহংসদেব প্রায় ভক্তসঙ্গে বসিতেন ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা কহিতেন বা সংকীর্তন করিতেন। এই পূর্ব বারান্দার অপরার্ধ উত্তরমুখো। এ-বারান্দায় ভক্তেরা তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহার জন্মোৎসব করিতেন, তাঁহার সঙ্গে বসিয়া সংকীর্তন করিতেন; আবার তিনি তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে বসিয়া কতবার প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। এই বারান্দায় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন শিষ্যসমভিব্যাহারে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে কত আলাপ করিয়াছেন; আমোদ করিতে করিতে মুড়ি, নারিকেল, লুচি, মিষ্টান্নাদি একসঙ্গে বসিয়া খাইয়া গিয়াছেন। এই বারান্দায় নরেন্দ্রকে দর্শন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।

[আনন্দনিকেতন]

কালীবাড়ি আনন্দনিকেতন হইয়াছে। রাধাকান্ত, ভবতারিণী ও মহাদেবের নিত্যপূজা, ভোগরাগাদি ও অতিথিসেবা। একদিকে ভাগীরথীর বহুদূর পর্যন্ত পবিত্র দর্শন। আবার সৌরভাকুল সুন্দর নানাবর্ণরঞ্জিত কুসুমবিশিষ্ট মনোহর পুষ্পোদ্যান। তাহাতে আবার একজন চেতনমানুষ অহর্নিশ ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আছেন। আনন্দময়ীর নিত্য উৎসব। নহবত হইতে রাগরাগিণী সর্বদা বাজিতেছে। একবার প্রভাতে বাজিতে থাকে মঙ্গলারতির সময়। তারপর বেলা নয়টার সময়—যখন পূজা আরম্ভ হয়। তারপর বেলা দ্বিপ্রহরের সময়—তখন ভোগ আরতির পর ঠাকুর-ঠাকুরানীরা বিশ্রাম করিতে যান। আবার বেলা চারিটার সময় নহবত বাজিতে থাকে—তখন তাঁহারা বিশ্রামলাভের পর গাত্রোত্থান করিতেছেন ও মুখ ধুইতেছেন। তারপর আবার সন্ধ্যারতির সময়। অবশেষে রাত নয়টার সময়—যখন শীতলের পর ঠাকুর-শয়ন হয়, তখন আবার নহবত বাজিতে থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম দর্শন

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥
[শ্রীমদ্ভাগবত, ১০/৩১/৯, গোপীগীতা, রাসপঞ্চাধ্যায়]

গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি। মা-কালীর মন্দির। বসন্তকাল, ইংরেজী ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস। ঠাকুরের জন্মোৎসবের কয়েক দিন পরে। শ্রীযুক্ত কেশব সেন ও শ্রীযুক্ত জোসেফ্ কুক সঙ্গে ২৩শে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার (১২ই ফাল্গুন, ১২৮৮, শুক্লা ষষ্ঠী) ঠাকুর স্টীমারে বেড়াইয়াছিলেন—তাহারই কয়েকদিন পরে। সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুর

www.udbodhan.org

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে মাস্টার আসিয়া উপস্থিত। এই প্রথম দর্শন।[১] দেখিলেন, একঘর লোক নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন। ঠাকুর তক্তপোশে বসিয়া পূর্বাস্য হইয়া সহাস্যবদনে হরি কথা কহিতেছেন। ভক্তেরা মেজেয় বসিয়া আছেন।

[কর্মত্যাগ কখন?]

মাস্টার দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। তাঁহার বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ-কথা কহিতেছেন, আর সর্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে। অথবা যেন শ্রীচৈতন্য পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নামগুণকীর্তন করিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, ''যখন একবার হরি বা একবার রামনাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো যে সন্ধ্যাদি কর্ম—আর করতে হবে না। তখন কর্মত্যাগের অধিকার হয়েছে—কর্ম আপনা-আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। তখন কেবল রামনাম, কি হরিনাম, কি শুদ্ধ ওঁকার জপলেই হলো।'' আবার বলিলেন, ''সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী আবার ওঁকারে লয় হয়।''

মাস্টার সিধুর[২] সঙ্গে বরাহনগরের এ-বাগানে ও-বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন। আজ রবিবার, অবসর আছে, তাই বেড়াইতে আসিয়াছেন; শ্রীযুক্ত প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের বাগানে কিয়ৎক্ষণ পূর্বে বেড়াইতেছিলেন। তখন সিধু বলিয়াছিলেন, ''গঙ্গার ধারে একটি চমৎকার বাগান আছে, সে-বাগানটি কি দেখতে যাবেন? সেখানে একজন পরমহংস আছেন।''

বাগানে সদর ফটক দিয়া ঢুকিয়াই মাস্টার ও সিধু বরাবর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আসিলেন। মাস্টার অবাক্ হইয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছেন, ''আহা কি সুন্দর স্থান! কি সুন্দর মানুষ! কি সুন্দর কথা! এখান থেকে নড়তে ইচ্ছা করছে না।'' কিয়ৎক্ষণ পরে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ''একবার দেখি কোথায় এসেছি। তারপর এখানে এসে বসব।''

সিধুর সঙ্গে ঘরের বাহিরে আসিতে না আসিতে আরতির মধুর শব্দ হইতে লাগিল। এককালে কাঁসর, ঘণ্টা, খোল, করতালি বাজিয়া উঠিল। বাগানের দক্ষিণসীমান্ত হইতে নহবতের মধুর শব্দ আসিতে লাগিল। সেই শব্দ ভাগীরথীবক্ষে যেন ভ্রমণ করিতে করিতে অতিদূরে গিয়া কোথায় মিশিয়া যাইতে লাগিল। মন্দ মন্দ কুসুমগন্ধবাহী বসন্তানিল! সবে জ্যোৎস্না উঠিতেছে। ঠাকুরদের আরতির যেন চতুর্দিকে আয়োজন হইতেছে! মাস্টার দ্বাদশ শিবমন্দিরে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে ও শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে আরতি দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। সিধু বলিলেন, ''এটি রাসমণির দেবালয়। এখানে নিত্যসেবা। অনেক অতিথি, কাঙাল আসে।''

কথা কহিতে কহিতে ভবতারিণীর মন্দির হইতে বৃহৎ পাকা উঠানের মধ্য দিয়া পাদচারণ করিতে করিতে দুইজনে আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। এবার দেখিলেন, ঘরের দ্বার দেওয়া।

এইমাত্র ধুনা দেওয়া হইয়াছে। মাস্টার ইংরেজী পড়িয়াছেন, ঘরে হঠাৎ প্রবেশ করিতে পারিলেন না। দ্বারদেশে বৃন্দে (ঝি) দাঁড়াইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, ''হ্যাঁ গা, সাধুটি কি এখন এর ভিতর আছেন?''

বৃন্দে—হ্যাঁ, এই ঘরের ভিতর আছেন।

মাস্টার—ইনি এখানে কতদিন আছেন?

বৃন্দে—তা অনেকদিন আছেন—

---

১ প্রথম দর্শনের তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ আছে।—প্রঃ

২ শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মজুমদার, উত্তর বরাহনগরে বাড়ি

www.udbodhan.org

মাস্টার—আচ্ছা, ইনি কি খুব বই-টই পড়েন?

বৃন্দে—আর বাবা বই-টই! সব ওঁর মুখে!

মাস্টার সবে পড়াশুনা করে এসেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বই পড়েন না শুনে আরও অবাক্ হলেন।

মাস্টার—আচ্ছা, ইনি বুঝি এখন সন্ধ্যা করবেন?—আমরা কি এ-ঘরের ভিতর যেতে পারি?—তুমি একবার খবর দিবে?

বৃন্দে—তোমরা যাও না বাবা। গিয়ে ঘরে বস।

তখন তাঁহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, ঘরে আর অন্য কেহ নাই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে একাকী তক্তপোশের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে ধুনা দেওয়া হইয়াছে ও সমস্ত দরজা বন্ধ। মাস্টার প্রবেশ করিয়াই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিতে অনুজ্ঞা করিলে তিনি ও সিধু মেঝেতে বসিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, ''কোথায় থাক, কি কর, বরাহনগরে কি করতে এসেছ'' ইত্যাদি। মাস্টার সমস্ত পরিচয় দিলেন। কিন্তু দেখিতে লাগিলেন যে, ঠাকুর মাঝে মাঝে যেন অন্যমনস্ক হইতেছেন। পরে শুনিলেন, এরই নাম ভাব। যেমন কেহ ছিপ হাতে করিয়া মাছ ধরিতে বসিয়াছে। মাছ আসিয়া টোপ খাইতে থাকিলে ফাতনা যখন নড়ে, সে ব্যক্তি যেমন শশব্যস্ত হইয়া ছিপ হাতে করিয়া ফাতনার দিকে একদৃষ্টে একমনে চাহিয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা কয় না; এ-ঠিক সেইরূপ ভাব। পরে শুনিলেন ও দেখিলেন, ঠাকুরের সন্ধ্যার পর এইরূপ ভাবান্তর হয়, কখনও কখনও তিনি একেবারে বাহ্যশূন্য হন!

মাস্টার—আপনি এখন সন্ধ্যা করবেন, তবে এখন আমরা আসি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)—না—সন্ধ্যা—তা এমন কিছু নয়।

আর কিছু কথাবার্তার পর মাস্টার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, ''আবার এস''।

মাস্টার ফিরিবার সময় ভাবিতে লাগিলেন, ''এ সৌম্য কে?—যাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে—বই না পড়িলে কি মানুষ মহৎ হয়?—কি আশ্চর্য, আবার আসিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইনিও বলিয়াছেন, 'আবার এস'! কাল কি পরশু সকালে আসিব।''

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় দর্শন

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

গুরুশিষ্য-সংবাদ

দ্বিতীয় দর্শন সকাল বেলা, আটটার সময়। ঠাকুর তখন কামাতে যাচ্ছেন। এখনও একটু শীত আছে। তাই তাঁহার গায়ে মোলেস্কিনের র‍্যাপার। র‍্যাপারের কিনারা শালু দিয়ে মোড়া। মাস্টারকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি এসেছ? আচ্ছা, এখানে বস।

এ-কথা দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় হইতেছিল। নাপিত উপস্থিত। সেই বারান্দায় ঠাকুর কামাইতে বসিলেন ও মাঝে মাঝে মাস্টারের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। গায়ে ওইরূপ র‍্যাপার, পায়ে চটি জুতা, সহাস্যবদন। কথা কহিবার সময় কেবল একটু তোতলা।

www.udbodhan.org

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—**হ্যাঁগা, তোমার বাড়ি কোথায়?**

মাস্টার—আজ্ঞা, কলিকাতায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখানে কোথায় এসেছ?

মাস্টার—এখানে বরাহনগরে বড়দিদির বাড়ি আসিয়াছি। ঈশান কবিরাজের বাটী।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওহ্ ঈশেনের বাড়ি!

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন ও মার কাছে ঠাকুরের ক্রন্দন

শ্রীরামকৃষ্ণ—হ্যাঁগা, কেশব কেমন আছে? বড় অসুখ হয়েছিল।

মাস্টার—আমিও শুনেছিলাম বটে, এখন বোধ হয় ভাল আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি আবার কেশবের জন্য মার কাছে ডাব-চিনি মেনেছিলুম। শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে যেত, আর মার কাছে কাঁদতুম, বলতুম, মা, কেশবের অসুখ ভাল করে দাও; কেশব না থাকলে আমি কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কব? তাই ডাব-চিনি মেনেছিলুম।

"হ্যাঁগা, কুক্ সাহেব নাকি একজন এসেছে? সে নাকি লেকচার দিচ্ছে? আমাকে কেশব জাহাজে তুলে নিয়ে গিছিল। কুক্ সাহেবও ছিল।"

মাস্টার—আজ্ঞা, এইরকম শুনেছিলুম বটে, কিন্তু আমি তাঁর লেকচার শুনি নাই। আমি তাঁর বিষয় বিশেষ জানি না।

[গৃহস্থ ও পিতার কর্তব্য]

শ্রীরামকৃষ্ণ—প্রতাপের ভাই এসেছিল। এখানে কয়দিন ছিল। কাজকর্ম নাই। বলে, আমি এখানে থাকব। শুনলাম, মাগছেলে সব শ্বশুরবাড়িতে রেখেছে। অনেকগুলি ছেলেপিলে। আমি বকলুম, দেখ দেখি ছেলেপিলে হয়েছে; তাদের কি আবার ও-পাড়ার লোক এসে খাওয়াবে-দাওয়াবে, মানুষ করবে? লজ্জা করে না যে, মাগছেলেদের আর একজন খাওয়াচ্ছে, আর তাদের শ্বশুরবাড়ি ফেলে রেখেছে। আমরা অনেক বকলুম, আর কর্মকাজ খুঁজে নিতে বললুম। তবে এখান থেকে যেতে চায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

মাস্টারকে তিরস্কার ও তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণকরণ

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—তোমার কি বিবাহ হয়েছে?

মাস্টার—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিহরিয়া)—ওরে রামলাল[১]! যাঃ, বিয়ে করে ফেলেছে!

মাস্টার ঘোরতর অপরাধীর ন্যায় অবাক্ হইয়া অবনতমস্তকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, বিয়ে করা কি এত দোষ!

ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি ছেলে হয়েছে?

১ শ্রীযুক্ত রামলাল, ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কালীবাড়ির পূজারী।

www.udbodhan.org

মাস্টারের বুক ঢিপঢিপ করিতেছে। ভয়ে ভয়ে বলিলেন, আজ্ঞে, ছেলে হয়েছে। ঠাকুর আবার আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, যাঃ, ছেলে হয়ে গেছে! তিরস্কৃত হইয়া তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কৃপাদৃষ্টি করিয়া সস্নেহে বলিতে লাগিলেন, ''দেখ, তোমার লক্ষণ ভাল ছিল, আমি কপাল, চোখ—এ-সব দেখলে বুঝতে পারি। আচ্ছা, তোমার পরিবার কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি?''

[জ্ঞান কাহাকে বলে? প্রতিমাপূজা]

মাস্টার—আজ্ঞা ভাল, কিন্তু অজ্ঞান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)—আর তুমি জ্ঞানী?

তিনি **জ্ঞান** কাহাকে বলে, **অজ্ঞান** কাহাকে বলে, এখনও জানেন না। এখনও পর্যন্ত জানিতেন যে, লেখাপড়া শিখিলে ও বই পড়িতে পারিলে জ্ঞান হয়। এই ভ্রম পরে দূর হইয়াছিল। তখন শুনিলেন যে, ঈশ্বরকে জানার নাম **জ্ঞান**, ঈশ্বরকে না জানার নামই **অজ্ঞান**। ঠাকুর বলিলেন, ''তুমি কি জ্ঞানী!'' মাস্টারের অহঙ্কারে আবার বিশেষ আঘাত লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, তোমার 'সাকারে' বিশ্বাস, না 'নিরাকারে'?

মাস্টার (অবাক্ হইয়া স্বগত)—সাকারে বিশ্বাস থাকলে কি নিরাকারে বিশ্বাস হয়? ঈশ্বর নিরাকার, এ-বিশ্বাস থাকিলে ঈশ্বর সাকার এ-বিশ্বাস কি হইতে পারে? বিরুদ্ধ অবস্থা দুটাই কি সত্য হইতে পারে? সাদা জিনিস—দুধ, কি আবার কালো হতে পারে?

মাস্টার—আজ্ঞা, নিরাকার—আমার এইটি ভাল লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বেশ। একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হলো। নিরাকারে বিশ্বাস, তাতো ভালই। তবে এ-বুদ্ধি করো না যে, এইটি কেবল সত্য আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধরে থাকবে।

মাস্টার দুইই সত্য এই কথা বারবার শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। এ-কথা তো তাঁহার পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে নাই।

তাঁহার অহঙ্কার তৃতীয়বার চূর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। তাই আবার একটু তর্ক করিতে অগ্রসর হইলেন।

মাস্টার—আজ্ঞা, তিনি সাকার, এ-বিশ্বাস যেন হলো! কিন্তু মাটির প্রতিমা তিনি তো নন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—মাটি কেন গো! **চিন্ময়ী প্রতিমা।**

মাস্টার 'চিন্ময়ী প্রতিমা' বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, আচ্ছা, যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে, তাদের তো বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে পূজা করা উচিত।

[লেকচার (Lecture) ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)—তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক! কেবল লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া! আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই! তুমি বুঝাবার কে? যাঁর জগৎ, তিনি বুঝাবেন। যিনি এই জগৎ করেছেন, চন্দ্র, সূর্য, মানুষ, জীবজন্তু করেছেন; জীবজন্তুদের খাবার উপায়, পালন করবার জন্য মা-বাপ করেছেন, মা-বাপের স্নেহ করেছেন তিনিই বুঝাবেন। তিনি এত উপায় করেছেন, আর এ-উপায় করবেন না? যদি বুঝাবার দরকার হয় তিনিই

www.udbodhan.org

বুঝাবেন। তিনি তো অন্তর্যামী। যদি ওই মাটির প্রতিমাপূজা করাতে কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না—তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ওই পূজাতেই সন্তুষ্ট হন। তোমার ওর জন্য মাথা ব্যথা কেন? তুমি নিজের যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয়, তার চেষ্টা কর!

এইবার তাঁহার অহঙ্কার বোধ হয় একেবারে চূর্ণ হইল।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইনি যা বলেছেন তাতো ঠিক! আমার বুঝাতে যাবার কি দরকার! আমি কি ঈশ্বরকে জেনেছি—না আমার তাঁর উপর ভক্তি হয়েছে! "আপনি শুতে স্থান পায় না, শঙ্করাকে ডাকে!" জানি না, শুনি না, পরকে বুঝাতে যাওয়া বড়ই লজ্জার কথা ও হীনবুদ্ধির কাজ! একি অঙ্কশাস্ত্র, না ইতিহাস, না সাহিত্য যে পরকে বুঝাব! এ-যে ঈশ্বরতত্ত্ব। ইনি যা বলছেন, মনে বেশ লাগছে।

ঠাকুরের সহিত তাঁহার এই প্রথম ও শেষ তর্ক।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি মাটির প্রতিমাপূজা বলছিলে। যদি মাটিরই হয়, সে-পূজাতে প্রয়োজন আছে। নানারকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন। যার জগৎ তিনিই এ-সব করেছেন—অধিকারী ভেদে। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।

"এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়িতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানারকম ব্যঞ্জন করেছেন—যার যা পেটে সয়! কারও জন্য মাছের পোলোয়া, কারও জন্য মাছের অম্বল, মাছের চড়চড়ি, মাছ ভাজা—এই সব করেছেন। যেটি যার ভাল লাগে। যেটি যার পেটে সয়—বুঝলে?"

মাস্টার—আজ্ঞে হাঁ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সংসারার্ণবঘোরে যঃ কর্ণধারস্বরূপকঃ।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ভক্তির উপায়

মাস্টার (বিনীতভাবে)—ঈশ্বরে কি করে মন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—**ঈশ্বরের নামগুণগান সর্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ**—ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এঁদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয়কাজের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না। মাঝেমাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন।

"যখন চারাগাছ থাকে, তখন তার চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলে।

"ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে। আর সর্বদা সদসৎ বিচার করবে। ঈশ্বরই সৎ—কিনা নিত্যবস্তু, আর সব অসৎ—কিনা অনিত্য। এই বিচার করতে করতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ করবে।"

মাস্টার (বিনীতভাবে)—সংসারে কিরকম করে থাকতে হবে?

[গৃহস্থ সন্ন্যাস—উপায়—নির্জনে সাধন]

শ্রীরামকৃষ্ণ—**সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে।** স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা—সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জানবে যে, তারা তোমার কেউ নয়।

"বড় মানুষের বাড়ির দাসী সব কাজ কচ্ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে মনিবের

www.udbodhan.org

ছেলেদের আপনার ছেলের মতো মানুষ করে। বলে 'আমার রাম', 'আমার হরি', কিন্তু মনে বেশ জানে—এরা আমার কেউ নয়।

"কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জানো?—আড়ায় পড়ে আছে। যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারের সব কর্ম করবে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে।

"ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার করতে যাও তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ—এ-সবে অধৈর্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয়-চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে।

"তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়! তা না হলে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।

"কিন্তু এই ভক্তিলাভ করতে হলে নির্জন হওয়া চাই। মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর নির্জনে বসে, সব কাজ ফেলে দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়।

"আবার দেখ, এই মনে নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা করলে জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে ওই মন নীচ হয়ে যায়। সংসারে কেবল কামিনী-কাঞ্চন চিন্তা।

"সংসার জল, আর মনটি যেন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখ, তাহলে দুধে-জলে মিশে এক হয়ে যায়, খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তাহলে ভাসে। তাই নির্জনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসার-জলে ফেলে রাখলেও মিশবে না, ভেসে থাকবে।

"সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়—এই পর্যন্ত। ভগবানলাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না—এর নাম বিচার, বুঝেছ?"

মাস্টার—আজ্ঞে হাঁ; প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক আমি সম্প্রতি পড়েছি, তাতে আছে 'বস্তুবিচার'।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, *বস্তুবিচার!* এই দেখ, টাকাতেই বা কি আছে, আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে! বিচার কর, সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্বি, মল, মূত্র—এই সব আছে। এই সব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়?

[ঈশ্বর দর্শনের উপায়]

মাস্টার—ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, অবশ্য করা যায়। মাঝে মাঝে নির্জনে বাস; তাঁর নামগুণগান, বস্তুবিচার—এই সব উপায় অবলম্বন করতে হয়।

মাস্টার—কী অবস্থাতে তাঁকে দর্শন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। মাগছেলের জন্য লোকে একঘটি কাঁদে, টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে? ডাকার মতো ডাকতে হয়।

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন ঃ

"ডাক দেখি মন ডাকার মতো কেমন শ্যামা থাকতে পারে।
কেমন শ্যামা থাকতে পারে, কেমন কালী থাকতে পারে ॥
মন যদি একান্ত হও, জবা বিল্বদল লও,

www.udbodhan.org

ভক্তি-চন্দন মিশাইয়ে (মার) পদে পুষ্পাঞ্জলি দাও ॥

"ব্যাকুলতা হলেই অরুণ উদয় হলো। তারপর সূর্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন।

"তিন টান একত্র হলে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর, আর সতীর পতির উপর টান। এই তিন টান যদি কারও একসঙ্গে হয়, সেই টানের জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে।

"কথাটা এই, ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে। মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয় ভালবাসে। এই তিনজনের ভালবাসা, এই তিন টান একত্র করলে যতখানি হয়, ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শন লাভ হয়।

"ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা চাই। বিড়ালের ছানা কেবল 'মিউ মিউ' করে মাকে ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানেই থাকে— কখনো হেঁশেলে, কখনো মাটির উপর, কখনো বা বিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হলে সে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে, আর কিছু জানে না। মা যেখানেই থাকুক, এই মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তৃতীয় দর্শন

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥

[গীতা—৬।২৯]

[নরেন্দ্র, ভবনাথ, মাস্টার]

মাস্টার তখন বরাহনগরে ভগিনীর বাড়িতে ছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করা অবধি সর্বক্ষণ তাঁহারই চিন্তা। সর্বদাই যেন সেই আনন্দময় মূর্তি দেখিতেছেন ও তাঁহার সেই অমৃতময়ী কথা শুনিতেছেন। ভাবিতে লাগিলেন, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিরূপে এই সব গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেন ও জানিলেন? আর এত সহজে এই সকল কথা বুঝাইতে তিনি এ-পর্যন্ত কাহাকেও কখনও দেখেন নাই। কখন তাঁহার কাছে যাইবেন ও আবার তাঁহাকে দর্শন করিবেন এই কথা রাত্রদিন ভাবিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে রবিবার আসিয়া পড়িল। বরাহনগরের নেপালবাবুর সঙ্গে বেলা ৩টা-৪টার সময় তিনি দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আসিয়া পৌঁছিলেন। দেখিলেন, সেই পূর্বপরিচিত ঘরের মধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট তক্তপোশের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে একঘর লোক। রবিবারে অবসর হইয়াছে, তাই ভক্তেরা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। এখনও মাস্টারের সঙ্গে কাহারও আলাপ হয় নাই, তিনি সভামধ্যে একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। দেখিলেন, ভক্তসঙ্গে সহাস্যবদনে ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

একটি ঊনবিংশতিবর্ষ বয়স্ক ছোকরাকে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁহার দিকে তাকাইয়া ঠাকুর যেন কত আনন্দিত হইয়া অনেক কথা বলিতেছিলেন। ছেলেটির নাম নরেন্দ্র। কলেজে পড়েন ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন। কথাগুলি তেজঃপরিপূর্ণ। চক্ষু দুটি উজ্জ্বল। ভক্তের চেহারা।

মাস্টার অনুমানে বুঝিলেন যে, কথাটি বিষয়াসক্ত সংসারী ব্যক্তির সম্বন্ধে হইতেছিল। যারা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করে, ধর্ম ধর্ম করে তাদের ওই সকল ব্যক্তিরা নিন্দা করে। আর সংসারে কত দুষ্ট লোক আছে, তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত—এ-সব কথা হইতেছে।

www.udbodhan.org

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—নরেন্দ্র! তুই কি বলিস? সংসারী লোকেরা কত কি বলে! কিন্তু দেখ, হাতি যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চিৎকার করে। কিন্তু হাতি ফিরেও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তুই কি মনে করবি?

নরেন্দ্র—আমি মনে করব, কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—না রে, অত দূর নয়। (সকলের হাস্য) ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে; মন্দ লোকের কাছ থেকে তফাত থাকতে হয়। বাঘের ভিতরেও নারায়ণ আছেন; তা বলে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না। (সকলের হাস্য) যদি বল বাঘ তো নারায়ণ, তবে কেন পালাব। তার উত্তর—যারা বলছে ''পালিয়ে এস'' তারাও নারায়ণ, তাদের কথা কেন না শুনি?

''একটা গল্প শোন্‌। কোন এক বনে একটি সাধু থাকেন। তাঁর অনেকগুলি শিষ্য। তিনি একদিন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সর্বভূতে নারায়ণ আছেন, এইটি জেনে সকলকে নমস্কার করবে। একদিন একটি শিষ্য হোমের জন্য কাঠ আনতে বনে গিছল। এমন সময়ে একটা রব উঠল, 'কে কোথায় আছ পালাও—একটা পাগলা হাতি যাচ্ছে।' সবাই পালিয়ে গেল, কিন্তু শিষ্যটি পালাল না! সে জানে যে, হাতিও যে নারায়ণ তবে কেন পালাব? এই বলে দাঁড়িয়ে রইল। নমস্কার করে স্তবস্তুতি করতে লাগল। এদিকে মাহুত চেঁচিয়ে বলছে 'পালাও, পালাও'; শিষ্যটি তবুও নড়ল না। শেষে হাতিটা শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে তাকে একধারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। শিষ্য ক্ষতবিক্ষত হয়ে ও অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল।

''এই সংবাদ পেয়ে গুরু ও অন্যান্য শিষ্যেরা তাকে আশ্রমে ধরাধরি করে নিয়ে গেল। আর ঔষধ দিতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে চেতনা হলে ওকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি হাতি আসছে শুনেও কেন চলে গেলে না?' সে বললে, 'গুরুদেব আমায় বলে দিয়েছিলেন যে, নারায়ণই মানুষ, জীবজন্তু সব হয়েছেন। তাই আমি হাতি নারায়ণ আসছে দেখে সেখান থেকে সরে যাই নাই।' গুরু তখন বললেন, 'বাবা, হাতি নারায়ণ আসছিলেন বটে, তা সত্য; কিন্তু বাবা, মাহুত নারায়ণ তো তোমায় বারণ করেছিলেন। যদি সবই নারায়ণ তবে তার কথা বিশ্বাস করলে না কেন? মাহুত নারায়ণের কথাও শুনতে হয়।' (সকলের হাস্য)

''শাস্ত্রে আছে 'আপো নারায়ণঃ'—জল নারায়ণ। কিন্তু কোন জল ঠাকুর সেবায় চলে; আবার কোন জলে আঁচানো, বাসনমাজা, কাপড়কাচা কেবল চলে; কিন্তু খাওয়া বা ঠাকুরসেবা চলে না। তেমনি সাধু, অসাধু, ভক্ত, অভক্ত—সকলেরই হৃদয়ে নারায়ণ আছেন। কিন্তু অসাধু, অভক্ত, দুষ্ট লোকের সঙ্গে ব্যবহার চলে না। মাখামাখি চলে না। কারও সঙ্গে কেবল মুখের আলাপ পর্যন্ত চলে, আবার কারও সঙ্গে তাও চলে না। ওইরূপ লোকের কাছ থেকে তফাতে থাকতে হয়।''

একজন ভক্ত—মহাশয়, যদি দুষ্ট লোকে অনিষ্ট করতে আসে বা অনিষ্ট করে, তাহলে কি চুপ করে থাকা উচিত?

[গৃহস্থ ও তমোগুণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—লোকের সঙ্গে বাস করতে গেলেই দুষ্ট লোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্য একটু তমোগুণ দেখানো দরকার! কিন্তু সে অনিষ্ট করবে বলে উলটে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়।

''এক মাঠে এক রাখাল গরু চরাত। সেই মাঠে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ ছিল। সকলেই সেই সাপের ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে থাকত। একদিন একটি ব্রহ্মচারী সেই মাঠের পথ দিয়ে আসছিল। রাখালেরা দৌড়ে এসে বললে, 'ঠাকুর মহাশয়! ওদিক দিয়ে যাবেন না। ওদিকে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ আছে।' ব্রহ্মচারী বললে, 'বাবা, তা হোক; আমার তাতে ভয় নাই, আমি মন্ত্র জানি!' এই কথা বলে ব্রহ্মচারী সেইদিকে চলে গেল। রাখালেরা ভয়ে কেউ সঙ্গে গেল না। এদিকে সাপটা ফণা তুলে দৌড়ে আসছে, কিন্তু কাছে না আসতে আসতে ব্রহ্মচারী যেই একটি

www.udbodhan.org

মন্ত্র পড়লে, অমনি সাপটা কেঁচোর মতন পায়ের কাছে পড়ে রইল। ব্রহ্মচারী বললে, 'ওরে, তুই কেন পরের হিংসা করে বেড়াস; আয় তোকে মন্ত্র দিব। এই মন্ত্র জপলে তোর ভগবানে ভক্তি হবে, ভগবানলাভ হবে, আর হিংসা প্রবৃত্তি থাকবে না।' এই বলে সে সাপকে মন্ত্র দিল। সাপটা মন্ত্র পেয়ে গুরুকে প্রণাম করলে আর জিজ্ঞাসা করলে, 'ঠাকুর! কি করে সাধনা করব, বলুন?' গুরু বললেন, 'এই মন্ত্র জপ কর, আর কারও হিংসা করো না।' ব্রহ্মচারী যাবার সময় বললে, 'আমি আবার আসব।'

''এইরকমে কিছুদিন যায়। রাখালেরা দেখে যে, সাপটা আর কামড়াতে আসে না! ঢ্যালা মারে তবুও রাগ হয় না, যেন কেঁচোর মতন হয়ে গেছে। একদিন একজন রাখাল কাছে গিয়ে ল্যাজ ধরে খুব ঘুরপাক দিয়ে তাকে আছড়ে ফেলে দিলে। সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল, আর সে অচেতন হয়ে পড়ল। নড়ে না, চড়ে না। রাখালেরা মনে করলে যে, সাপটা মরে গেছে। এই মনে করে তারা সব চলে গেল।

''অনেক রাত্রে সাপের চেতনা হলো। সে আস্তে আস্তে অতি কষ্টে তার গর্তের ভিতর চলে গেল। শরীর চূর্ণ—নড়বার শক্তি নাই। অনেকদিন পরে যখন অস্থিচর্মসার তখন বাহিরে আহারের চেষ্টায় রাত্রে এক-একবার চরতে আসত; ভয়ে দিনের বেলা আসত না, মন্ত্র লওয়া অবধি আর হিংসা করে না। মাটি, পাতা, গাছ থেকে পড়ে গেছে এমন ফল খেয়ে প্রাণধারণ করত।

''প্রায় এক বৎসর পরে ব্রহ্মচারী সেইপথে আবার এল। এসেই সাপের সন্ধান করলে। রাখালেরা বললে, 'সে সাপটা মরে গেছে।' ব্রহ্মচারীর কিন্তু ও-কথা বিশ্বাস হলো না! সে জানে, যে-মন্ত্র ও নিয়েছে তা সাধন না হলে দেহত্যাগ হবে না। খুঁজে খুঁজে সেইদিকে তার দেওয়া নাম ধরে ডাকতে লাগল। সে গুরুদেবের আওয়াজ শুনে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল ও খুব ভক্তিভাবে প্রণাম করলে। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করলে, 'তুই কেমন আছিস?' সে বললে, 'আজ্ঞে ভাল আছি' ব্রহ্মচারী বললে, 'তবে তুই এত রোগা হয়ে গিছিস কেন?' সাপ বললে, 'ঠাকুর আপনি আদেশ করেছেন—কারও হিংসা করো না, তাই পাতাটা ফলটা খাই বলে বোধ হয় রোগা হয়ে গিছি!' **ওর সত্ত্বগুণ হয়েছে কি না, তাই কারু উপর ক্রোধ নাই।** সে ভুলেই গিয়েছিল যে, রাখালেরা মেরে ফেলবার যোগাড় করেছিল। ব্রহ্মচারী বললে, 'শুধু না খাওয়ার দরুন এরূপ অবস্থা হয় না, অবশ্য আরও কারণ আছে, ভেবে দেখ।' সাপটার মনে পড়ল যে, রাখালেরা আছাড় মেরেছিল। তখন সে বললে, 'ঠাকুর মনে পড়েছে বটে, রাখালেরা একদিন আছাড় মেরেছিল। তারা অজ্ঞান, জানে না যে আমার মনের কি অবস্থা; আমি যে কাহাকেও কামড়াব না বা কোনরূপ অনিষ্ট করব না, কেমন করে জানবে?' ব্রহ্মচারী বললে, 'ছি! তুই এত বোকা, আপনাকে রক্ষা করতে জানিস না; আমি কামড়াতে বারণ করেছি, ফোঁস করতে নয়! ফোঁস করে তাদের ভয় দেখাস নাই কেন?'

''দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস করতে হয়, ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে। তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নাই, অনিষ্ট করতে নাই।''

[ভিন্ন প্রকৃতি—Are all men euqal?]

''ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নানারকম জীবজন্তু, গাছপালা আছে। জানোয়ারের মধ্যে ভাল আছে মন্দ আছে। বাঘের মতো হিংস্র জন্তু আছে। গাছের মধ্যে অমৃতের ন্যায় ফল হয় এমন আছে; আবার বিষফলও আছে। তেমনি মানুষের মধ্যে ভাল আছে, মন্দও আছে; সাধু আছে, অসাধুও আছে; সংসারী জীব আছে আবার ভক্ত আছে।

''জীব চারপ্রকার ঃ—বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব।

''নিত্যজীব ঃ—যেমন নারদাদি। এরা সংসারে থাকে জীবের মঙ্গলের জন্য—জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য।

www.udbodhan.org

“বদ্ধজীব ঃ—বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থাকে— ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না।

“মুমুক্ষুজীব ঃ—যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হতে পারে, কেউ বা পারে না।

“মুক্তজীব ঃ—যারা সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে আবদ্ধ নয়— যেমন সাধু-মহাত্মারা; যাদের মনে বিষয়বুদ্ধি নাই, আর যারা সর্বদা হরিপাদপদ্ম চিন্তা করে।

“যেমন জাল ফেলা হয়েছে পুকুরে। দু-চারটা মাছ এমন সেয়ানা যে, কখনও জালে পড়ে না—এরা নিত্যজীবের উপমাস্থল। কিন্তু অনেক মাছই জালে পড়ে। এদের মধ্যে কতকগুলি পালাবার চেষ্টা করে। এরা মুমুক্ষুজীবের উপমাস্থল। কিন্তু সব মাছই পালাতে পারে না। দু-চারটে ধপাঙ ধপাঙ করে জাল থেকে পালিয়ে যায়, তখন জেলেরা বলে, ওই একটা মস্ত মাছ পালিয়ে গেল! কিন্তু যারা জালে পড়েছে, অধিকাংশই পালাতেও পারে না; আর পালাবার চেষ্টাও করে না। বরং জাল মুখে করে, পুকুরের পাঁকের ভিতরে গিয়ে চুপ করে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে থাকে— মনে করে, আর কোন ভয় নাই, আমরা বেশ আছি। কিন্তু জানে না যে, জেলে হড় হড় করে টেনে আড়ায় তুলবে। এরাই বদ্ধজীবের উপমাস্থল।”

[সংসারী লোক— বদ্ধজীব]

“বদ্ধজীবেরা সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ হয়েছে, হাত-পা বাঁধা। আবার মনে করে যে, সংসারের ওই কামিনী ও কাঞ্চনেতেই সুখ হবে, আর নির্ভয়ে থাকবে। জানে না যে, ওতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধজীব যখন মরে তার পরিবার বলে, ‘তুমি তো চললে, আমার কি করে গেলে?’ আবার এমনি মায়া যে, প্রদীপটাতে বেশি সলতে জ্বললে বদ্ধজীব বলে, ‘তেল পুড়ে যাবে সলতে কমিয়ে দাও।’ এদিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রয়েছে!

“বদ্ধজীবেরা ঈশ্বরচিন্তা করে না। যদি অবসর হয় তাহলে হয় আবোল-তাবোল ফালতো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমি চুপ করে থাকতে পারিনা, তাই বেড়া বাঁধছি। হয়তো সময় কাটে না দেখে তাস খেলতে আরম্ভ করে।” (সকলে স্তব্ধ)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ [গীতা—১০।৩]

উপায়—বিশ্বাস

একজন ভক্ত—মহাশয়, এরূপ সংসারী জীবের কি উপায় নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ—অবশ্য উপায় আছে। মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ আর মাঝে মাঝে নির্জনে থেকে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়। আর বিচার করতে হয়। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, আমাকে ভক্তি বিশ্বাস দাও।

“বিশ্বাস হয়ে গেলেই হলো। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই।

(কেদারের প্রতি)—“বিশ্বাসের কত জোর তা তো শুনেছ? পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হলো। কিন্তু হনুমান রামনামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে পড়ল। তার সেতুর দরকার হয় নাই। (সকলের হাস্য)

“বিভীষণ একটি পাতায় রামনাম লিখে ওই পাতাটি একটি লোকের কাপড়ের খোঁটে বেঁধে দিছল। সে লোকটি সমুদ্রের পারে যাবে। বিভীষণ তাকে বললে, ‘তোমার ভয় নাই, তুমি বিশ্বাস করে জলের উপর দিয়ে চলে যাও, কিন্তু দেখ যাই অবিশ্বাস করবে, অমনি জলে ডুবে যাবে।’ লোকটি বেশ সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল; এমন সময়ে তার ভারী ইচ্ছা হলো যে, কাপড়ের খোঁটে কি বাঁধা আছে একবার দেখে! খুলে দেখে যে, কেবল ‘রামনাম’ লেখা রয়েছে!

www.udbodhan.org

তখন সে ভাবলে, ‘এ কি! শুধু রামনাম একটি লেখা রয়েছে!’ যাই অবিশ্বাস, অমনি ডুবে গেল।

‘‘যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে—গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী হত্যা করে, তবুও ভগবানে এই বিশ্বাসের বলে ভারী ভারী পাপ থেকে উদ্ধার হতে পারে। সে যদি বলে আর আমি এমন কাজ করব না, তার কিছুতেই ভয় হয় না।’’

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন ঃ

[মহাপাতক ও নামমাহাত্ম্য]

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।

আখেরে এ-দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী ॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী।
এ-সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি ॥

[নরেন্দ্র—হোমাপাখি]

‘‘এই ছেলেটিকে দেখছ, এখানে একরকম। দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেমন জুজুটি, আবার চাঁদনিতে যখন খেলে, তখন আর এক মূর্তি। এরা নিত্যসিদ্ধের থাক। এরা সংসারে কখনও বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে জীবশিক্ষার জন্য। এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না—এরা কামিনীকাঞ্চনে কখনও আসক্ত হয় না।

‘‘বেদে আছে হোমাপাখির কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখি থাকে। সেই আকাশেতেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লে ডিমটা পড়তে থাকে—কিন্তু এত উঁচু যে, অনেকদিন থেকে ডিমটা পড়তে থাকে। ডিম পড়তে পড়তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোখ ফোটে ও ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে পড়ে যাচ্ছে, মাটিতে লাগলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখি মার দিকে একেবারে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায়।’’

নরেন্দ্র উঠিয়া গেলেন।

সভামধ্যে কেদার, প্রাণকৃষ্ণ, মাস্টার ইত্যাদি অনেকে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ, নরেন্দ্র গাইতে, বাজাতে, পড়াশুনায়—সব তাতেই ভাল। সেদিন কেদারের সঙ্গে তর্ক করছিল। কেদারের কথাগুলো কচকচ করে কেটে দিতে লাগল। (ঠাকুর ও সকলের হাস্য) (মাস্টারের প্রতি)—ইংরাজীতে কি কোন তর্কের বই আছে গা?

মাস্টার—আজ্ঞে হাঁ, ইংরেজীতে ন্যায়শাস্ত্র (Logic) আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, কিরকম একটু বল দেখি।

মাস্টার এইবার মুশকিলে পড়িলেন। বলিলেন, একরকম আছে সাধারণ সিদ্ধান্ত থেকে বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। যেমন ঃ

সব মানুষ মরে যাবে,
পণ্ডিতেরা মানুষ,
অতএব পণ্ডিতেরা মরে যাবে।

‘‘আর একরকম আছে, বিশেষ দৃষ্টান্ত বা ঘটনা দেখে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। যেমন ঃ

www.udbodhan.org

এ কাকটা কালো,
ও কাকটা কালো
(আবার) যত কাক দেখছি সবই কালো,
অতএব সব কাকই কালো।

"কিন্তু এরকম সিদ্ধান্ত করলে ভুল হতে পারে, কেননা হয়তো খুঁজতে খুঁজতে আর এক দেশে সাদা কাক দেখা গেল। আর এক দৃষ্টান্ত—যেখানে বৃষ্টি সেইখানে মেঘ ছিল বা আছে; অতএব এই সাধারণ সিদ্ধান্ত হলো যে, মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। আরও এক দৃষ্টান্ত—এ-মানুষটির বত্রিশ দাঁত আছে, ও-মানুষটির বত্রিশ দাঁত, আবার যে-কোন মানুষ দেখছি তারই বত্রিশ দাঁত আছে। অতএব সব মানুষেরই বত্রিশ দাঁত আছে।

"এরূপ সাধারণ সিদ্ধান্তের কথা ইংরেজী ন্যায়শাস্ত্রে আছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কথাগুলি শুনিলেন মাত্র। শুনিতে শুনিতেই অন্যমনস্ক হইলেন। কাজে কাজেই আর এ-বিষয়ে বেশি প্রসঙ্গ হইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ [গীতা—২।৫৩]

সমাধিমন্দিরে

সভা ভঙ্গ হইল। ভক্তেরা এদিক ওদিক পায়চারি করিতেছেন। মাস্টারও পঞ্চবটী ইত্যাদি স্থানে বেড়াইতেছেন, বেলা আন্দাজ পাঁচটা। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দিকে আসিয়া দেখিলেন, ঘরের উত্তরদিকের ছোট বারান্দার মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার হইতেছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। নরেন্দ্র গান করিতেছেন, দুই-চারিজন ভক্ত দাঁড়াইয়া আছেন। মাস্টার আসিয়া গান শুনিতেছেন। গান শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া রহিলেন। **ঠাকুরের গান ছাড়া এমন মধুর গান তিনি কখনও কোথাও শুনেন নাই।** হঠাৎ ঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। ঠাকুর দাঁড়াইয়া নিস্পন্দ, চক্ষুর পাতা পড়িতেছে না; নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বহিছে কিনা বহিছে! জিজ্ঞাসা করাতে একজন ভক্ত বলিলেন, এর নাম **সমাধি!** মাস্টার এরূপ কখনও দেখেন নাই, শুনেন নাই। অবাক্ হইয়া তিনি ভাবিতেছেন, ভগবানকে চিন্তা করিয়া মানুষ কি এত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়? না জানি কতদূর বিশ্বাস-ভক্তি থাকলে এরূপ হয়। গানটি এই ঃ

চিন্তয় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন।
কিবা, অনুপমভাতি, মোহনমূরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন।
নবরাগে রঞ্জিত, কোটি শশী-বিনিন্দিত;
(কিবা) বিজলি চমকে, সেরূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন।

গানের এই চরণটি গাহিবার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শিহরিতে লাগিলেন। দেহ রোমাঞ্চিত! চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতেছে। মাঝে মাঝে যেন কি দেখিয়া হাসিতেছেন। না জানি 'কোটি শশী-বিনিন্দিত' কি অনুপম রূপদর্শন করিতেছেন! এরই নাম কি ভগবানের চিন্ময়-রূপ-দর্শন? কত সাধন করিলে, কত তপস্যার ফলে, কতখানি ভক্তি-বিশ্বাসের বলে, এরূপ ঈশ্বর-দর্শন হয়? আবার গান চলিতেছে ঃ

www.udbodhan.org

হৃদি-কমলাসনে, ভজ তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয়দর্শন!

আবার সেই ভুবনমোহন হাস্য! শরীর সেইরূপ নিস্পন্দ! স্তিমিত লোচন! কিন্তু কি যেন অপরূপ রূপদর্শন করিতেছেন! আর সেই অপরূপ রূপদর্শন করিয়া যেন মহানন্দে ভাসিতেছেন!

এইবার গানের শেষ হইল। নরেন্দ্র গাইলেন ঃ

চিদানন্দরসে, ভক্তিযোগাবেশে, হও রে চিরমগন।
(চিদানন্দরসে, হায় রে) (প্রেমানন্দরসে) ॥

সমাধির ও প্রেমানন্দের এই অদ্ভুত ছবি হৃদয়মধ্যে গ্রহণ করিয়া মাস্টার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে হৃদয়মধ্যে সেই হৃদয়োন্মত্তকারী মধুর সঙ্গীতের ফুট উঠিতে লাগিল ঃ

“প্রেমানন্দরসে হও রে চিরমগন।” (হরিপ্রেমে মত্ত হয়ে)

নবম পরিচ্ছেদ

চতুর্থ দর্শন

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ [গীতা—৬।২২]

[নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতির সঙ্গে আনন্দ]

তাহার পরদিনও ছুটি ছিল। বেলা তিনটার সময় মাস্টার আবার আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পূর্বপরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। মেঝেতে মাদুর পাতা। সেখানে নরেন্দ্র, ভবনাথ, আরও দুই-একজন বসিয়া আছেন। কয়টিই ছোকরা, উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়স। ঠাকুর সহাস্যবদন, ছোট তক্তপোশের উপর বসিয়া আছেন, আর ছোকরাদের সহিত আনন্দে কথাবার্তা কহিতেছেন।

মাস্টার ঘরে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়াই ঠাকুর উচ্চহাস্য করিয়া ছোকরাদের বলিয়া উঠিলেন, “ওই রে আবার এসেছে!” —বলিয়াই হাস্য। সকলে হাসিতে লাগিল। মাস্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন।—আগে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতেন—ইংরেজী পড়া লোকেরা যেমন করে। কিন্তু আজ তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে শিখিয়াছেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে, শ্রীরামকৃষ্ণ কেন হাসিতেছিলেন, তাহাই নরেন্দ্রাদি ভক্তদের বুঝাইয়া দিতেছেন।

“দেখ, একটা ময়ূরকে বেলা চারটার সময় আফিম খাইয়ে দিছিল। তার পরদিন ঠিক চারটার সময় ময়ূরটা উপস্থিত—আফিমের মৌতাত ধরেছিল—ঠিক সময়ে আফিম খেতে এসেছে!” (সকলের হাস্য)

মাস্টার মনে মনে ভাবিতেছেন, “ইনি ঠিক কথাই বলিতেছেন। বাড়িতে যাই কিন্তু দিবানিশি ইঁহার দিকে মন পড়িয়া থাকে— কখন দেখিব, কখন দেখিব। এখানে কে যেন টেনে আনলে! মনে করলে অন্য জায়গায় যাবার জো নাই, এখানে আসতেই হবে!” এইরূপ ভাবিতেছেন, ঠাকুর এদিকে ছোকরাগুলির সহিত অনেক ফষ্টিনাষ্টি করিতে লাগিলেন যেন তারা সমবয়স্ক। হাসির লহরী উঠিতে লাগিল। যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে।

মাস্টার অবাক্ হইয়া এই অদ্ভুত চরিত্র দেখিতেছেন। ভাবিতেছেন, ইঁহারই কি পূর্বদিনে সমাধি ও অদৃষ্টপূর্ব প্রেমানন্দ দেখিয়াছিলাম? সেই ব্যক্তি কি আজ প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন? ইনিই কি আমায় প্রথম দিনে উপদেশ

www.udbodhan.org

দিবার সময় তিরস্কার করেছিলেন? ইনিই কি আমায় ''তুমি কি জ্ঞানী'' বলেছিলেন? ইনিই কি সাকার-নিরাকার দুই সত্য বলেছিলেন? ইনিই কি আমায় বলেছিলেন যে, ঈশ্বরই সত্য আর সংসারের সমস্তই অনিত্য? ইনিই কি আমায় সংসারে দাসীর মতো থাকতে বলেছিলেন?

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ করিতেছেন ও মাস্টারকে এক-একবার দেখিতেছেন। দেখিলেন, তিনি অবাক্ হইয়া বসিয়া আছেন। তখন রামলালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ''দেখ্, এর একটু উমের বেশি কিনা, তাই একটু গম্ভীর। এরা এত হাসিখুশি করছে, কিন্তু এ চুপ করে বসে আছে।'' মাস্টারের বয়স তখন সাতাশ বৎসর হইবে।

কথা কহিতে কহিতে পরম ভক্ত হনুমানের কথা উঠিল। হনুমানের পট একখানি ঠাকুরের ঘরের দেওয়ালে ছিল। ঠাকুর বলিলেন, ''দেখ, হনুমানের কি ভাব! ধন, মান, দেহসুখ কিছুই চায় না; কেবল ভগবানকে চায়! যখন স্ফটিকস্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে পালাচ্ছে তখন মন্দোদরী অনেকরকম ফল নিয়ে লোভ দেখাতে লাগল। ভাবলে ফলের লোভে নেমে এসে অস্ত্রটা যদি ফেলে দেয়; কিন্তু হনুমান ভুলবার ছেলে নয়; সে বললে ঃ

[গীত—'শ্রীরামকল্পতরু']

আমার কি ফলের অভাব।
পেয়েছি যে ফল, জনম সফল,
মোক্ষ-ফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে ॥
শ্রীরামকল্পতরুমূলে বসে রই—
যখন যে ফল বাঞ্ছা সেই ফল প্রাপ্ত হই।
ফলের কথা কই, (ধনি গো), ও ফল গ্রাহক নই;
যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে ॥

[সমাধিমন্দিরে]

ঠাকুর এই গান গাহিতেছেন। আবার সেই **সমাধি!** আবার নিস্পন্দ দেহ, স্তিমিত লোচন, দেহ স্থির! বসিয়া আছেন—**ফটোগ্রাফে যেরূপ ছবি দেখা যায়।** ভক্তেরা এইমাত্র এত হাসিখুশি করিতেছিলেন, এখন সকলেই একদৃষ্টি হইয়া ঠাকুরের সেই অদ্ভুত অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছেন। সমাধি অবস্থা মাস্টার এই দ্বিতীয়বার দর্শন করিলেন। অনেকক্ষণ পরে ওই অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে। দেহ শিথিল হইল। মুখ সহাস্য হইল। ইন্দ্রিয়গণ আবার নিজের নিজের কার্য করিতেছে। চক্ষের কোণ দিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে ঠাকুর 'রাম রাম', এই নাম উচ্চারণ করিতেছেন।

মাস্টার ভাবিতে লাগিলেন, এই মহাপুরুষই কি ছেলেদের সঙ্গে ফচকিমি করিতেছিলেন? তখন ঠিক যেন পাঁচ বছরের বালক!

ঠাকুর পূর্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন। মাস্টারকে ও নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ''তোমরা দুজনে ইংরেজীতে কথা কও ও বিচার কর আমি শুনব।''

মাস্টার ও নরেন্দ্র উভয়ে এই কথা শুনিয়া হাসিতেছেন। দুজনে কিছু কিছু আলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাংলাতে। ঠাকুরের সামনে মাস্টারের বিচার আর সম্ভব নয়। তাঁহার তর্কের ঘর ঠাকুরের কৃপায় একরকম বন্ধ। আর কিরূপে তর্ক-বিচার করিবেন? ঠাকুর আর একবার জিদ করিলেন, কিন্তু ইংরেজীতে তর্ক করা হইল না।

www.udbodhan.org

দশম পরিচ্ছেদ

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং, ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা, সনাতনস্ত্বং, পুরুষো মতো মে ॥ [গীতা—১১।১৮]

অন্তরঙ্গ সঙ্গে—'আমি কে'?

পাঁচটা বাজিয়াছে। ভক্ত কয়টি যে যার বাড়িতে চলিয়া গেলেন। কেবল মাস্টার ও নরেন্দ্র রহিলেন। নরেন্দ্র গাড়ু লইয়া হাঁসপুকুরের ও ঝাউতলার দিকে মুখ ধুইতে গেলেন। মাস্টার ঠাকুরবাড়ির এদিক-ওদিক পায়চারি করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কুঠির কাছ দিয়া হাঁসপুকুরের দিকে আসিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পুকুরের দক্ষিণদিকের সিঁড়ির চাতালের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া; নরেন্দ্র গাড়ু হাতে করিয়া মুখ ধুইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, ''দেখ্, আর একটু বেশি বেশি আসবি। সবে নূতন আসছিস কিনা! প্রথম আলাপের পর নূতন সকলেই ঘন ঘন আসে, যেমন—নূতন পতি (নরেন্দ্র ও মাস্টারের হাস্য)। কেমন আসবি তো?'' নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের ছেলে, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ''হাঁ, চেষ্টা করব।''

সকলে কুঠির পথ দিয়া ঠাকুরের ঘরে আসিতেছেন। কুঠির কাছে মাস্টারকে ঠাকুর বলিলেন, ''দেখ, চাষারা হাটে গরু কিনতে যায়; তারা ভাল গরু, মন্দ গরু বেশ চেনে। ল্যাজের নিচে হাত দিয়ে দেখে। কোনও গরু ল্যাজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে, সে গরু কেনে না। যে গরু ল্যাজে হাত দিলে তিড়িং-মিড়িং করে লাফিয়ে উঠে সেই গরুকেই পছন্দ করে। নরেন্দ্র সেই গরুর জাত; ভিতরে খুব তেজ!'' এই বলিয়া ঠাকুর হাসিতেছেন। ''আবার কেউ কেউ লোক আছে, যেন চিঁড়ের ফলার, আঁট নাই, জোর নাই, ভ্যাৎ ভ্যাৎ করছে।''

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন; মাস্টারকে বলিলেন, ''তুমি নরেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করগে, আমায় বলবে কিরকম ছেলে।''

আরতি হইয়া গেল। মাস্টার অনেকক্ষণ পরে চাঁদনির পশ্চিম ধারে নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। পরস্পর আলাপ হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বলিলেন, আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের। কলেজে পড়িতেছি ইত্যাদি।

রাত হইয়াছে—মাস্টার এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন। কিন্তু যাইতে আর পারিতেছেন না। তাই নরেন্দ্রের নিকট হইতে আসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার গান শুনিয়া হৃদয়, মন মুগ্ধ হইয়াছে; বড় সাধ যে, আবার তাঁর শ্রীমুখে গান শুনিতে পান। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, মা-কালীর মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দিরের মধ্যে একাকী ঠাকুর পাদচারণ করিতেছেন। মার মন্দিরে মার দুইপার্শ্বে আলো জ্বলিতেছিল। বৃহৎ নাটমন্দিরে একটি আলো জ্বলিতেছে, ক্ষীণ আলোক। আলো ও অন্ধকার মিশ্রিত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ নাটমন্দিরে দেখাইতেছিল।

মাস্টার ঠাকুরের গান শুনিয়া আত্মহারা হইয়াছেন। যেন মন্ত্রমুগ্ধ সর্প। এক্ষণে সঙ্কুচিতভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''আজ আর কি গান হবে?'' ঠাকুর চিন্তা করিয়া বলিলেন, ''না, আজ আর গান হবে না।'' এই বলিয়া কি যেন মনে পড়িল, অমনি বলিলেন, ''তবে এক কর্ম করো। আমি বলরামের বাড়ি কলিকাতায় যাব, **তুমি যেও, সেখানে গান হবে।''**

মাস্টার—যে আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি জান? বলরাম বসু?

মাস্টার—আজ্ঞা না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বলরাম বসু। বোসপাড়ায় বাড়ি।

www.udbodhan.org

মাস্টার—যে আজ্ঞা, আমি জিজ্ঞাসা করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের সঙ্গে নাটমন্দিরে বেড়াইতে বেড়াইতে)—আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, **আমাকে তোমার কি বোধ হয়?**

মাস্টার চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন,

"তোমার **কি বোধ হয়?** আমার কয় আনা জ্ঞান হয়েছে?"

মাস্টার—'আনা' এ-কথা বুঝতে পারছি না; **তবে এরূপ জ্ঞান বা প্রেমভক্তি বা বিশ্বাস বা বৈরাগ্য বা উদার ভাব কখনও** কোথাও দেখি নাই।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতে লাগিলেন।

এরূপ কথাবার্তার পর মাস্টার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সদর ফটক পর্যন্ত আসিয়া আবার কি মনে পড়িল, অমনি ফিরিলেন। আবার নাটমন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিয়া উপস্থিত।

ঠাকুর সেই ক্ষীণালোকমধ্যে একাকী পাদচারণ করিতেছেন। *একাকী—নিঃসঙ্গ!* পশুরাজ যেন অরণ্যমধ্যে আপন মনে একাকী বিচরণ করিতেছেন! আত্মারাম; সিংহ একলা থাকতে, একলা বেড়াতে ভালবাসে! অনপেক্ষ!

অবাক্ হইয়া মাস্টার আবার সেই মহাপুরুষদর্শন করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—আবার যে ফিরে এলে?

মাস্টার—আজ্ঞা, বোধ হয় বড়-মানুষের বাড়ি—যেতে দিবে কি না; তাই যাব না ভাবছি। এইখানে এসেই আপনার সঙ্গে দেখা করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, তা কেন? তুমি আমার নাম করবে। বলবে তাঁর কাছে যাব, তাহলেই কেউ আমার কাছে নিয়ে আসবে।

মাস্টার "যে আজ্ঞা" বলিয়া আবার প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণের বলরাম-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে নৃত্য

রাত্রি ৮টা-৯টা হইবে। ৺দোলযাত্রা।[১] রাম, মনোমোহন, রাখাল, নিত্যগোপাল প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন। সকলেই হরিনাম সংকীর্তন করিতে করিতে মত্ত হইয়াছেন। কয়েকটি ভক্তের ভাবাবস্থা হইয়াছে। নিত্যগোপালের ভাবাবস্থায় বক্ষঃস্থল রক্তিমবর্ণ হইয়াছে। সকলে উপবেশন করিলে মাস্টার ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। দেখিলেন, রাখাল শুইয়া আছেন, ভাবাবিষ্ট ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ঠাকুর তাঁহার বুকে হাত দিয়া "'শান্ত হও" "শান্ত হও"

১ দোলযাত্রার ৭ দিন পরে হইবে। কারণ গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা মতে ওই বৎসর দোলযাত্রা ৪ঠা মার্চ ছিল। শ্রীমও এই পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন, ১১ই মার্চ, ১৮৮২, শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম-মন্দিরে আসিয়াছিলেন।—প্রঃ

www.udbodhan.org